১) ছিন্নপ্‌ত্রের তোমাদের পাঠ্য পত্রগুলিতে প্রকৃতি চিত্রনের কী রূপ লক্ষ্য করা যায় লেখ।

(১০ নম্বর)

নিজেদের পৈত্রিক জমিদারী দেখাশোনার জন্য রবীন্দ্রনাথ ওপার বাংলার পদ্মানদী তীরবর্তী শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসর অঞ্চলে কাটিয়েছিলেন ১৮৮৯ থেকে ১৮৯৫ খ্রীঃ সময়কাল পর্যন্ত। এই সময় জমিদারী কাছারি বাড়িতে থাকা ছাড়াও নিজের পদ্মা বোটে করে তিনি পদ্মা-বড়াল-ইছামতী ও অন্যান্য ছোট নদীতে জমিদারীর কাজেই বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন। ভ্রমণের আনন্দে, কখনো বা আরামে আলস্যে কাটিয়েছেন জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল। যুবক কবি মুগ্ধ হয়েছেন মূলত পদ্মার রূপ দেখে। বিশাল পদ্মার চলমান স্রোত, তার উঁচু দীর্ঘ পাড়, কখনো বা তার সাদা-কটা বালির বিস্তৃত চর সব কিছুই মুগ্ধ করেছে কবির মন। তাঁর এই মুগ্ধতার কথা সহজ সরল এবং হয়ত পদ্মার স্রোতের মতোই দ্রুতগতির গদ্যে অবিরল বর্ণনা করেছেন ভ্রাতুস্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখা এক একটি প্‌ত্রে। শুধু পদ্মা নয়, বরং বলা যেতে পারে নদী কেন্দ্রিক শিলাইদহ অঞ্চলের সম্পূর্ণ প্রকৃতি, নদীর দুই তীরের সবুজ শ্যামলতা, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের রঙের ছটা, এমনকি সেখানকার মানুষ ও তাদের সহজসরল জীবনযাপন, তাদের দারিদ্র্য, সেখানকার পল্লি জীবনের দুএকটি রূপ এই চিঠিগুলিতে বার বার ফিরে ফিরে এসেছে। তবে মূলত প্রকৃতি চিত্রনের জন্যই ছিন্নপত্রের মূল্য অপরিসীম।

ছিন্নপত্রে আমাদের পাঠ্য চিঠিগুলি হল ১০, ১৮, ৩০, ৬৭ ও ১০৮ নং চিঠি। প্রতিটি চিঠিই ইন্দিরা দেবীকে লেখা। কলকাতার মতো শহরে বড় হয়ে উঠেছেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে সারাদিনের ব্যস্ততা, ছ্যাকরা গাড়ির হৈ হৈ, বাবুদের কর্ম চঞ্চলতার আভাস জোড়াসাঁকোর বাড়ি থেকেই পাওয়া যেত। প্রকৃতিকে সেখানে তিনি 'আড়াল আবডাল' থেকে দেখতেন। যুবক কবি শিলাইদহে গিয়ে যেন প্রকৃতির একেবারে মাঝখানে পড়েছিলেন। এখানে এসে তাই তাঁর মনে হয়েছে –

''প্রকৃতি যে বাস্তবিক কি আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়।'' (১০ নং পত্র)।

পদ্মা আর পদ্মা নদীর দিগন্ত বিস্তৃত চর কবিকে যেন প্রথমেই আকর্ষণ করেছে। প্রকাণ্ড চর ধু ধু করছে। তার যেন শেষ নেই। মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় নদীর রেখা দেখা যায়। কখন বা বালিকেই নদী বলে ভ্রম হয়। চারদিক শুন্য। লোক নেই, তরু নেই, তৃণ নেই। কবি লিখেছেন –

''---উপরে অনন্ত নীলিমা আর নীচে অনন্ত পান্ডুরতা, আকাশ শুন্য এবং ধরণীও শূন্য, নীচে দরিদ্র শুষ্ক কঠিন শূন্যতা আর উপরে অশরীরী উদার শূন্যতা। এমনতর desolation কোথাও দেখা যায় না।'' (১০ নং)

সবকিছুই এখানে যেন আশ্চর্য স্বপ্নের মতো। সন্ধ্যার পর কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে কবি বেড়াতে বেরিয়েছেন পদ্মার চরে। আর এক প্রকৃতির এক অসীম শূন্যতায় কবি যেন হারিয়ে গেছেন। এমনকি

এই পরিবেশে এক মহা জাগতিক চেতনা কবিকে গ্রাস করেছে । এই পদ্মার চরে প্রতিদিনের সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত কবির চিত্তে এক অপূর্ব অনুভূতি নিয়ে এসেছে । তাঁর মনে হয়েছে –

''সূর্য আস্তে আস্তে ভোরের বেলা পূর্ব দিক থেকে কী এক প্রকাণ্ড গ্রন্থের পাতা খুলে দিচ্ছে এবং সন্ধ্যা পশ্চিম থেকে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে যে-এক প্রকাণ্ড পাতা উল্টে দিচ্ছে সেই বা কি আশ্চর্য লিখন ---।'' (১০ নং)

সবকিছুকেই তাঁর মনে হয়েছে প্রকৃতির এক আশ্চর্য পাঠশালা । কলকাতায় বসে এসব ভাবনা হয়ত কবিতার মতো বলে মনে হবে । কিন্তু শিলাইদহে তা একান্তই বাস্তব ।

১৮ নং পত্রে এই পৃথিবীর প্রতি কবির ভালোবাসার কথা আছে । এর গাছপালা, নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সবকিছুকেই কবি যেন আঁকড়ে ধরতে চান । পৃথিবীর কাছ থেকে যে ধন আমরা পেয়েছি তা যেন স্বর্গের কাছ থেকেও পাওয়া অসম্ভব ছিল । তবে প্রকৃতির এই রূপ যেন বিষাদ মাখা । কবি লিখেছেন –

''আমি এই পৃথিবীকে ভারী ভালোবাসি । এর মুখে ভারী একটা সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে – '' ।

পদ্মা নদীতে ভ্রমণ বা বেড়ানো হয়ত তা কোন কাজের জন্যই তা কবির কাছে সব সময় আনন্দময় । পদ্মায় ভ্রমণের জন্য তাঁর নিজের ছিল 'পদ্মা' নামের বোট । সেখানে স্বাচ্ছ্যন্দের কোন অভাব ছিল না । পদ্মায় ভেসে বেড়ানোতেই যেন শান্তি । রোগভোগের পর তাঁর দুর্বল শরীরকে আরামও দেয় পদ্মা । ৬৭ নং পত্রে এই শান্তি ও পদ্মা ভ্রমণের আনন্দের কথা আছে । কবি লিখেছেন –

''স্রোতের অনুকূলে বোট চলছে , তার উপর পাল পেয়েছে; দুপুরবেলাকার রোদ্দুরে শীতের দিনটা ঈষৎ তেতে উঠেছে ; পদ্মায় নৌকা নেই ; শূন্য বালির চর হলদে রঙ, একদিকে নদীর নীল আর এক দিকে আকাশের নীলের মাঝে একটি রেখার মতো আঁকা রয়েছে – জল কেবল উত্তরে বাতাসে খুব অল্প অল্প চিকচিক করে কাঁপছে, ঢেউ নেই ।'' (৬৭ নং)।

পদ্মা নদী কবির কাছে কোনদিন পুরনো হয় না । তার সুকোমল নীল বিস্তার, তার সুনবীন শ্যামল রেখা , তার বর্ণ এবং নৃত্য এবং সংগীত সবই একই রকম থেকে যায় । পদ্মার এই চির নবীন রূপ কবিকে অভিভূত করে । পদ্মা এবং পদ্মা কেন্দ্রিক প্রকৃতির প্রতি কবির ভলোবাসার যেন কোন শেষ নেই । প্রকৃতি থেকেই কবি পৌঁছে যান বৃহতর পৃথিবীর প্রতি তাঁর ভালোবাসায় । তিনি লেখেন –

''এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন ; আমাদের দু'জনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে ।'' (৬৭ নং) ।

এ প্রসঙ্গেই কবির মনে হয় পৃথিবী সৃষ্টির একেবারে আদিম লগ্নের কথা যা তিনি তাঁর 'বসুন্ধরা' কবিতায় লিখেছেন । এই পত্রেও পৃথিবীকে তাঁর মনে হয়েছে যেন 'বহু সন্তানবতী মা ।' 'একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল' গায়ে দিয়ে এই মা যেন যেন নদীতীরের শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন ।

এমনি ভাবে আমাদের পাঠ্য ছিন্ন পত্রের চিঠিগুলিতে প্রকৃতি চিত্রনের কথা উঠে এসেছে । প্রকৃতির কথাই চিঠিগুলির যেন মূল আলোচ্য । যুবক কবির কবিমনে পদ্মা আর তার পরিবেশ যে মুগ্ধতার সঞ্চার করেছিল তার সুন্দর বর্ণনা চিঠিগুলিতে আছে ।

-----------------------o----------------------------